উম্মাহর মহিরুহ

# আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

লেখক : মাহমুদ সাঈদ আযযাম

অনুবাদ : টিম সিজদাহ

সিজদাহ
পাবলিকেশন

আশ-শুয়ুখ মুজাহিদ ক্যাম্প ৪২
ক্যাম্পের দুটি ঘটনা ৪৩
**প্রথম ঘটনা :** একজন সদস্যও সালাতের জামাতে দাঁড়ায়নি! ৪৩
**দ্বিতীয় ঘটনা :** চে গুয়েভারা আমার পদতলে ৪৩
ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্নকরণ ৪৪
আল আজহার থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন ৪৪
উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে শায়খের জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন ৪৫
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারাদেশ ৪৫
সরকার ও নিজ সংগঠন : দুই দিক থেকে দুই প্রতিনিধিদল ৪৬

## তৃতীয় অধ্যায়

সৌদি অভিমুখে ৪৮
উসতাদ সানানিরি রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪৮
উসতাদ সানানিরির মিসর অভিমুখে যাত্রা ৪৯
শায়খের শোক প্রকাশ ৫০
আফগান অভিমুখে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ৫১
পর্যবেক্ষণ-সফর শেষে পুনরায় পাকিস্তানে আগমন ৫৩
সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা ৫৩
সেবাসংস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো ৫৯
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ : আরব ও আফগানদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের সেতু ৬১
মতভিন্নতার সহাবস্থানে শায়খের ভূমিকা ৬২
আফগানিদের সাথে আরব মুজাহিদদের আচরণবিধির একটি দৃষ্টান্ত ৬৩
মুজাহিদদের প্রতি বিনয় ৬৭
আফগানিদের কাছে আরবদের অবস্থান ৬৮
১৯৮৬ সনের পরিস্থিতি ৭০
পাকিস্তানি সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ৭০
প্রবল চাপ ৭৩
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ওপর চাপ ৭৪
শায়খ ও আরব মুজাহিদদের ওপর পাশ্চাত্য মিডিয়ার আক্রমণ ৭৬

## চতুর্থ অধ্যায়


শায়খের চারিত্রিক কিছু দিক ৭৮
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর নামাজ ৭৯
শায়খের ওজু ৮০
জিহাদ ৮০
আলেমদের প্রতি শায়খের অসিয়ত ৮১
দুআর ক্ষেত্রে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর রীতি ৮২
মানুষের সাথে শায়খের আচার-আচরণের কিছু দিক ৮৩
তার যাপিত জীবনের একটি অধ্যায় ৮৩
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বাহ্যিক পরিচ্ছদ ৮৫
নিরাপত্তা পর্যায়ে ৮৫
সরকারি পর্যায়ে ৮৫
অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দুটি ঘটনা ৮৬
**প্রথম ঘটনা** **৮৭**
**দ্বিতীয় ঘটনা** **৮৮**
আমরা কারও ক্রীতদাস নই ৮৯
অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা ৯০
ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ৯১
অমূল্য বচন ৯৩
হৃদয়ে খচিত স্মৃতিগুলো ৯৪
শায়খ রহিমাহুল্লাহর সংস্কারমূলক কাজের কিছু নমুনা ১০০
শায়খের ভাষ্যে আফগান ময়দানে ইসলামি দাওয়াহ থেকে কিছু শিক্ষা ১০৯


## পঞ্চম অধ্যায়


আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ১১৪
রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সক্ষমতার ব্যাপারে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ১১৫
বহির্বিশ্বের দেশসমূহ ১১৫
আমেরিকা ১১৫
আরব জাতীয়তাবাদের সামরিক অভ্যুত্থান ১১৬

ব্রিটেন ১১৮
ফ্রান্স ১১৮
ইউরোপ (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য) ১১৮
জিহাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক ভীতির ব্যাপারে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ১১৯
ইসলামি আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামি অঙ্গনের কিছু অভিজ্ঞতা ১২২
জিহাদের বিদ্যাপীঠ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ১২৩
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গির সারনির্যাস ১২৫
গোয়েন্দা তৎপরতার জটিলতার ব্যাপারে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ১২৯
মুজাহিদদের সামনে আগত বাধাগুলোর ব্যাপারে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ১৩০

## ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বব্যাপী শায়খের ভ্রমণ ১৩৩
শায়খের কুয়েত সফর ১৩৪
লাহোর কনফারেন্স ১৩৫
ঐতিহাসিক ভাষণ : হৃদয়ের আর্তনাদ! ১৩৭
বিভিন্ন চিঠিপত্র ১৩৯

## সপ্তম অধ্যায়

ইখওয়ান ও শায়খ ১৪১
জিহাদি কাজে শায়খের স্ট্রাটেজি ১৪৩
ইখওয়ানের প্রতি শায়খের কিছু প্রস্তাব ১৪৪
হারাকাত ও আলেমদের পক্ষাবলম্বন ১৪৫
সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির দিন শায়খের অবস্থা ১৪৮
ইমাম হাসানুল বান্নার মানহাজ সমর্থন ১৫১

## অষ্টম অধ্যায়

**শায়খ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে আযযাম রহিমাহুল্লাহর সম্পর্ক ১৫৩**
পরিচিতি পর্ব ১৫৩
শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও আফগানে জিহাদি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ১৫৩
পৃথক কার্যক্রমের সূচনা ১৫৪

শায়খের অনুসৃত নীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক ১৫৫
শায়খের শাহাদাত পরবর্তী সময়ে শায়খ উসামার কার্যক্রম ১৫৭

## নবম অধ্যায়

শায়খ ও ফিলিস্তিন ১৬০
শায়খের প্রতি জুলুম ও জিহাদে নিষেধাজ্ঞা : হিজরতের সিদ্ধান্ত ১৬৪
আমেরিকা, ইহুদি ও তাদের অনুসারীদের প্রতি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ১৬৬
নতুন বছরে নতুন কোনো সামগ্রী নয় ১৭০
মুসলিমদের সংকট নিরসনে শায়খের গুরুত্ব ১৭১
ইন্তিফাদা জিহাদের লক্ষণ ১৭৪
সংগঠনরূপে হামাসের আত্মপ্রকাশ ১৭৫
শাহাদাতের দিন শায়খ সম্বন্ধে হামাসের বিবৃতি ১৭৬
হামাসের যুবকদের প্রতি শায়খের অসিয়ত ও নসিহত ১৭৮
ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৯

## দশম অধ্যায়

**শাহাদাতের পথে যাত্রা** **১৮৩**
শাহাদাতের তামান্না ১৮৩
শায়খের দৃষ্টিতে শহিদ কারা? ১৮৭
শাহাদাতের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শায়খকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা ১৮৮
শাহাদাতের কয়েক দিন পূর্বে ১৮৯
ইসলামাবাদ অভিমুখে কমান্ডারগণ ১৯০
শাহাদাতের মুহূর্ত ১৯১
শাহাদাতের পরপর যা ঘটেছে ১৯২
শায়খের শাহাদাতের প্রেক্ষাপটে জিহাদি নেতাদের অবস্থান ১৯৩
ড. কারজাবির দৃষ্টিতে শহিদ শায়খ আযযাম ১৯৩
বেনজির ভুট্টোর তারবার্তা ১৯৫
দুটি মজবুত স্তম্ভ ১৯৫
আরবের সরকারি মিডিয়াগুলোতে শায়খের শাহাদাতের সংবাদ ১৯৬
শায়খের হত্যাকাণ্ডের ফাইল ১৯৬

শাহাদাতের আগে ও পরে শায়খ সম্পর্কিত কয়েকটি স্বপ্ন ১৯৭
তার মতো যোগ্য নেতার খোঁজে ২০০

## একাদশ অধ্যায়

**ফিকহি মানহাজ** **২০৪**
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বক্তৃতার শৈলী ২০৪
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর খুতবার সূচনা ২০৬
যে কিতাবের কারণে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে ২০৮
শহিদদের প্রতি উৎসর্গিত বাণীসমূহ ২১২
শায়খের ভাষণে শিক্ষামূলক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা ২১৫
শায়খ রহিমাহুল্লাহর শোক প্রকাশের পদ্ধতি ২১৮
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ফিকির ও ইলম ২১৯
শায়খের দৃষ্টিতে তরবিয়তের ভিত্তিমূল ২২৩
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ইলমি ও ফিকরি উত্তরাধিকার ২২৪
প্রথম মারহালা ২২৫
দ্বিতীয় মারহালা ২৩০
তৃতীয় মারহালা ২৩১
চতুর্থ মারহালা ২৩২
পঞ্চম মারহালা ২৩২
ষষ্ঠ মারহালা ২৩৩
শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বিভাবিত বাণীসমূহ ২৩৪

# প্রারম্ভিকা

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। আম্মা বাদ।

শায়খের সঙ্গে আমি আমার জীবনের যে সময়টা কাটিয়েছি, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, নিঃসন্দেহে তাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, শ্রেষ্ঠ অর্জন। আমার জন্য তা ছিল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা, যেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আর এ কারণেই আমি বলি, নির্ভয়েই বলি, উম্মাহর এই পথিকৃতের সঙ্গে কাটানো সময়টাই আমার জীবনের প্রকৃত অংশ, যেহেতু এই সময়ের অভিজ্ঞতাই আমার মৌলিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করেছে। এটিই আমার ভেতরের সব ধরনের আঞ্চলিক, ভৌগোলিক, ভাষাভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা ভেঙেচুরে হৃদয়ের গভীরে ইসলামের সার্বজনীন ছবি এঁকে দিয়েছে।

এ কারণেই আমার উপলব্ধি হলো, যে কেউ একটা জীবন কাটালেই পুরোটা সময় তার 'জীবন' হিসেবে গণ্য করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কেউ কোনো এক জায়গায় কোনো এক সময়ে একটা জীবন অতিবাহিত করলেই তা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের অংশ হয়ে যায় না।

কখনো তো মানুষ পৃথিবীতে পূর্ণ একটা জীবন কাটিয়ে দেয়। অথচ বাস্তব জীবনে সে বিন্দুমাত্র ইতিবাচক প্রভাব রেখে যেতে পারে না। কখনো সে জীবনের দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়ে দেয়, কিন্তু সমাজের জন্য, উম্মাহর জন্য, এমনকি নিজের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে না।

কিন্তু আজ আমি কৃতজ্ঞতা ও ওয়াফাদারির দাবিতেই এই উম্মাহর এমন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লিখতে বসেছি, যিনি শুধু তার সময়ের জন্য না, বরং তার পরেও প্রজন্ম ও প্রজন্মান্তরের জন্য রেখে গেছেন কীর্তি ও পথের দিশা।

তিনি ছিলেন এমন একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব, যিনি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে সর্বতোভাবে তাকে ত্যাগ করেছিলেন। দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও তিনি করতেন না। পার্থিব জগৎ নয়, বরং জান্নাতুল ফেরদাউসই ছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা।

প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরেই, প্রতিটি উপলক্ষ্যেই তিনি উচ্চারণ করতেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সৌভাগ্যের জীবন দান করুন, শহিদি মরণ দান করুন, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলে হাশর করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

সময়ের হিসেবে তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। কিন্তু তার ভাষায় তার সত্যিকারের জীবন ছিল, ফিলিস্তিনে আর আফগানিস্তানে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কাটানো সময়টুকু। তিনি বলতেন, 'আমার সত্যিকারের জীবন হলো মাত্র নয় বছর। সাড়ে সাত বছর আফগানিস্তানে আর দেড় বছর ফিলিস্তিনে।'

উম্মাহর এমন একজন চিন্তানায়ক সম্পর্কে আমি লিখতে বসেছি, যার সান্নিধ্যে আমি ধন্য হয়েছি এক দীর্ঘ সময়, দিনে ও রাতে, গ্রীষ্মে ও শীতে, তার হাসি-কান্না, দুঃখ-কষ্ট, খুশি বা রাগের সময়ে। তার সঙ্গে আমি একটা জীবন অতিবাহিত করেছি তারই পরিবারের একজন হয়ে, তার সময়, সমাজ, পরিবেশ ও প্রতিবেশে। এবং তার চারপাশের তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ ও নানা শ্রেণির মানুষের মাঝে।

এ কারণেই আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল তার জীবনের স্মৃতিগুলোর কাছে ফিরে যাওয়া, তার জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল বাঁকগুলোতে আবার ফিরে তাকানো। যেন সমকালীন ইসলামি আন্দোলনের একজন কিংবদন্তির প্রাণপ্রাচুর্যেপূর্ণ আলোকদীপ্ত সৌরভমণ্ডিত জীবনের সারাংশটুকু পরিবেশন করা যায়। এই একটা জীবন উম্মাহর শত সহস্র জীবনে কী গভীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, কেমন করে রণাঙ্গনের জিহাদ-কিতাল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার ও পাঠদানের মধ্য দিয়ে একটা পূর্ণ প্রজন্ম গড়ে তুলেছিল, সেই উপাখ্যান যেন তুলে ধরা যায়।

সমকালীন ইসলামি রেনেসাঁ ও জাগরণমূলক আন্দোলনে কত দিক থেকে কতভাবে তিনি অবদান রেখেছেন, একটা ছোট্ট বইয়ে তার সবটুকু বিবরণ তুলে

ধরা মুশকিল হলেও কমপক্ষে জিহাদ-কিতালের যে স্রোতধারা তিনি উম্মাহর মাঝে বহমান করেছেন, শত্রু ও মুনাফিকদের চক্রান্তে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর মাঝে মৃতপ্রায় জিহাদি-আন্দোলনকে যেভাবে তিনি নতুন করে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে জাগরুক করেছেন, তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব। বরং এ ক্ষেত্রে হয়তো তারই অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে উম্মাহকে জাগিয়ে তুলতে, নতুন দিনের বিপ্লবের জন্য সবাইকে প্রস্তুত করতে একদিকে যেমন নির্ভয়ে সঠিক ফতোয়া দিয়ে গেছেন এবং নিজেও সেই ফতোয়ার বাস্তবায়নে আমল করে গেছেন, অন্যদিকে দেশ থেকে দেশান্তরে সফরে সফরে উম্মাহকে মুসলমানদের ভূমি দখলকারী সকল হানাদার সন্ত্রাসী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করে গেছেন।

তারই রচিত জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان (মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা হলো সবচেয়ে বড় ফরজ) গ্রন্থে তিনি বর্তমানে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর ফরজকে অন্য সকল ফরজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। এ বইয়ের অন্তর্গত একটি ফতোয়া হচ্ছে তার সবচেয়ে বিখ্যাত ফতোয়া।

'মুসলমানদের এক বিঘত ভূমির ওপরও যদি আগ্রাসন চালানো হয়, তাহলে সকল মুসলমান নর-নারীর ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সন্তান তার পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে যেতে পারবে, স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের হয়ে যাবে। তবে মাহরামের সঙ্গে বের হতে হবে। ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বের হয়ে যাবে।'

এ কারণেই তার কিতাবের শিরোনাম ছিল আহাম্মু ফুরুজিল আয়ইয়ান বা 'অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরজ'। অর্থাৎ প্রথমেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর তার পরেই মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কিতাল। আর এ শিরোনাম তিনি চয়ন করেছিলেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া থেকে। ফতোয়ার মর্ম ছিল, 'যে আগ্রাসী শত্রু দীন ও দুনিয়া নষ্ট করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় ফরজ কিছু নেই।'

শত্রুদের পক্ষে এমন একজন জীবন্ত মহিরুহকে খুব বেশিদিন সহ্য করা সম্ভব ছিল না, যিনি একই সঙ্গে ইলম ও উন্নত চিন্তার সমন্বয়ে এক হাতে অসি অন্য হাতে মসির যুগপৎ ব্যবহার করে যাবেন। সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে এই মহান ফরজ দায়িত্বটি বিকৃত, নিঃশেষ ও নিষ্প্রভ করে

দেওয়ার পর থেকে বহু বছর ধরে এই ধরনের আলেমের সঙ্গে তারা ছিল একেবারেই অপরিচিত। সুতরাং সালাফের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই মানুষটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করাটা তাদের জন্য ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

তারা ভেবেছিল এর মাধ্যমে তারা তার থেকে এবং তার লালিত চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু তারা ভাবতে পারেনি যে, উম্মাহর সিংহশাবকেরা তার হয়ে প্রতিশোধ নেবে। আর যেই সিংহশাবক জীবদ্দশায় তাদেরকে ভীত প্রকম্পিত করে রেখেছিলেন, মৃত্যুর পরও তিনি তাদেরকে ত্রস্ত-ব্যস্ত করেই রাখবেন।

কবির ভাষায় :

‘সাময়িক যে বিপদ আসে, তাতে আফসোসের কিছু নেই।
মৃত সিংহের গায়ে উঠে কত নেড়ি কুকুর নাচে!
সে ভাবে বুঝি সিংহের ওপরে উঠে গেছে।
কিন্তু সিংহ, সে তো সিংহই থাকে, আর কুকুর, সে কুকুরই থাকে।’

এই অনন্য মনীষী চিন্তা ও দর্শনের যে সম্পদ উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন, এরপর আর উম্মাহর জাগরণ, সংগ্রাম তার বেঁচে থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করে না। তার যা বলার তা বলে গিয়েছেন, যা কিছু করার ছিল করে গিয়েছেন। জীবিতদের মাঝে তার মৃত্যুর পরও তার চিন্তা ও দর্শন জেগে থাকবে। আর বারবার শত্রুর অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হতে থাকবে।

কথায় আছে, এমনও জাতি আছে, যাদের জীবিতরাও মৃত, আবার এমনও জাতি আছে, যাদের মৃতরাও অমর। আর এ দুইয়ের মাঝে তফাত তো আকাশ পাতাল।

উপসংহারে এসে আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছি, যা এ কিতাবকে শায়খের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্টে শোভিত করেছে।

১. বইটি লেখা হয়েছে একেবারেই সংক্ষেপে আর খুবই সহজ ভাষায়। পাঠক যে শ্রেণিরই হোক, বুঝতে কোনো কষ্ট হবে না।

২. পাঠক এই বইয়ে মাঝেমধ্যে এমন এমন তথ্য পাবেন, যা শায়খের জীবনী সম্পর্কে লিখিত অন্য কোনো বইয়ে নেই। আর এটা শায়খের সঙ্গে আমার নৈকট্য ও আত্মীয়তার কারণে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

৩. যেহেতু আমি শায়খের চিন্তা ও দর্শন গভীরভাবে অনুসরণ করেছি, শায়খের বক্তৃতা ও রচনা এবং শায়খ সম্পর্কে লিখিত বা উচ্চারিত সকল গ্রন্থ ও উক্তি সংকলনের উদ্যোগ নিয়েছি, তাই শায়খ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যারা জানেন, তাদের তালিকায় সম্ভবত আমার নামও আসবে।

৪. শায়খের যেসব উক্তি আমি উদ্ধৃত করেছি, তার প্রায় সবই শায়খের সঙ্গে আমার সান্নিধ্য ও সাহচর্যের সময়গুলোতে সরাসরি শোনা। তাই এগুলোর জন্য অন্য কোনো গ্রন্থ বা ব্যক্তির রেফারেন্স দিতে হয়নি।

৫. শায়খের সকল রচনা ও বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ আমি এ গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে দিয়েছি। যেহেতু পাকিস্তান শহিদ আযযাম মিডিয়া সেন্টারের মাধ্যমে আমিই ছিলাম এগুলোর সংকলন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্বশীল। আর এটা আমার এ বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ে পাওয়া যাবে না।

৬. বইটি আমি লিখেছিলাম এমন মুহূর্তে, যখন বিনাদোষে আমার কারাবাসের ১২ বছর কেটে গেছে। পরবর্তীতে জেল থেকে মুক্তি পেলে আমি একে সুবিন্যস্ত করেছি।

এই ভূমিকার শেষে এসে আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ সেন্টার এবং লেখক সংঘগুলোকে আহ্বান জানাব, শায়খের রেখে যাওয়া রচনা-গবেষণা, চিন্তা ও দর্শনের অমূল্য সম্পদগুলো প্রকাশ করে আলোর মুখ দেখাতে। যেন তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং তরুণ প্রজন্মের সামনে পরিবেশন করা যায়। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এসবই আলোর দিশারি হয়ে থাকবে।

মাহমুদ সাঈদ আযযাম
শাত্তাহ কারাগার। ৭ নং সেল
১৩ জুলাই ২০০৮

# প্রথম অধ্যায়

## জন্ম ও শৈশব

ফিলিস্তিনের জেনিনের সাইলাতুল হারিসিয়্যা গ্রামে ১৯৪১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সহজ-সরল সাধারণ দীনদার বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে ইসলামি ভাবধারায় বেড়ে ওঠেন। নিজ এলাকাতেই প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর 'খুদুরি এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট' থেকে পড়াশোনা শেষ করেন।

তার প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল সার্টিফিকেট আমি দেখেছি। সেখানে স্টারমার্ক ও ফার্স্ট ডিভিশনের নিচে কোনো গ্রেড নেই।

## বিশ্ববিদ্যালয়ে

শায়খ উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করার উদ্দেশ্যে দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৬৬ সনে ইসলামি শরিয়াহ বিষয়ে নিজ ব্যাচে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়ে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে জর্ডানের কারাক শহরের আদির এলাকায় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে সেখান থেকে বারকিন মাদরাসায় স্থানান্তরিত হন। এটা ছিল জেনিন শহরের কাছাকাছি এক এলাকা।

## ইসলামি দীক্ষা ও ইসলামি আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক

সর্বপ্রথম তাকে তরবিয়ত করেছিলেন তারই গ্রামের একজন, শায়খ শফিক আসআদ। তিনি ছিলেন জেনিনের 'আল হারাকাতুল ইসলামিয়া'[২]-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু শায়খের দীক্ষাকে পরিপূর্ণ করার আগেই দীক্ষাগুরুর ইন্তেকাল হয়ে যায়। মুরুব্বির ইন্তেকালের পর শায়খ তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক হৃদয়নিংড়ানো একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখন তার বয়স বিশ বছরও হয়নি। কিন্তু তখনই তার প্রজন্মের ও সমবয়সি ছেলেদের তুলনায় তার সাবলীল বাচনভঙ্গি ও অসাধারণ সাহস উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১২ বছর বয়সেই তিনি 'আল হারাকাতুল ইসলামিয়া'য় যোগদান করেন। ছোটবেলা থেকেই ইসলামি মূল্যবোধ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

নিজ ব্যক্তিত্বকে উত্তমরূপে তিনি শানিত করে তুলতে পেরেছিলেন। জর্ডান ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জেনারেল সেক্রেটারি আবু মাজেদ রহিমাহুল্লাহর দিব্যদৃষ্টি তার ব্যাপারে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। শায়খকে তার দীক্ষাগুরুর শোকসভায় সেই উপস্থিত বক্তৃতাটি করতে দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'এই ছেলের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।'

## শৈশবে বোনের সাথে

শায়খের শৈশবের বিষয়ে কিছু কথা না বললে লেখাটিই যেন অপূর্ণ থেকে যাবে। শায়খ ছিলেন তার পরিবারের সবচেয়ে ছোট আর সবার কাছে আদর ও ভালোবাসার পাত্র।

তার বড় বোন তার শৈশব সম্পর্কে বলেন, রাত কিংবা দিন কোনো সময়ই হাতে বই ছাড়া সে থাকত না। রাতে কখনো কখনো আমি ওর রুমে এসে দেখতাম, দিনভর পড়াশোনার ক্লান্তিতে বিছানায় বই বুকে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশে এখনো গ্যাসের বাতিটি জ্বলছে। এই অবস্থাতে আমি বইটি সরিয়ে নিতে গেলে

---

২. এ গ্রন্থে 'আল হারাকাতুল ইসলামিয়া', 'হারাকাতে ইসলামিয়া' কিংবা শুধু 'হারাকাত' শব্দ যেখানে এসেছে, সেখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামি আন্দোলন। শায়খ আযযাম যে হারাকাতে যুক্ত ছিলেন সে হারাকাতের নাম হলো 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন', সংক্ষেপে যাকে ইখওয়ান বলা হয়ে থাকে।

মাঝেমধ্যে ও টের পেয়ে যেত। তখনি ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠত এবং দু-হাতে সজোরে বই আকড়ে ধরত। আমি বলতাম, ভাইয়া, বাতিটা তোমার ওপর পড়ে যেতে পারে। তখন বিছানা পুড়ে যাবে, আগুন লেগে যাবে। এখন বই রাখো, ঘুমিয়ে পড়ো। এই ছিল রাতের অবস্থা।

দিনের বেলায় আমি বলতাম, তোমাকে তো বই পড়া ছাড়া কিছুই করতে দেখি না। তখন বই দেখিয়ে সে আমাকে উত্তর দিত, এটাই আমার নাওয়া-খাওয়া। এটাই আমার খেলাধুলা।

শায়খ কখনোই তার সমবয়সি আর দশজনের মতো ছিলেন না। তার বোন বলেন, ছোটবেলাতেই তিনি কসম করেছিলেন, জীবনে কোনোদিন হারাম খাবার মুখে দেবেন না। মাঝে মাঝে শায়খ সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পাহাড়ে ঘুরতে যেতেন।

বসন্তের আগমনে প্রকৃতি হয়তো তখন নতুন সাজে সেজেছে। বাহারি রঙের ফুলে আর সৌরভে বিমোহিত হয়ে আছে চারদিক। সবুজের চাদরে ঢেকে গেছে সমস্ত উপত্যকা। প্রকৃতির এমন পাগল-করা দৃশ্যে কিছুক্ষণ হয়তো শায়খ কোনো স্বচ্ছ জলাধারের পাশে নিশ্চুপ বসে থেকেছেন, খানিক পরই অজু করে সবুজ ঘাসের চাদরে সালাতে দাঁড়িয়ে গেছেন।

ওদিকে তার সঙ্গীরা ততক্ষণে পাহাড়িদের বাগানগুলো থেকে ফল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'কাজ' শেষে তারা শায়খের কাছে এসে বলত, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে খাচ্ছ না কেন?'

শায়খ উত্তর দিতেন, 'হারাম জিনিস আমি খাব না।'

এভাবেই শায়খ ছোট থেকে বড় হয়েছেন। ছোট থেকে তাকে আদর-স্নেহ দিয়ে নিজহাতে যিনি বড় করে তুলেছেন, তার সেই স্নেহময়ী বড় বোন আমাদেরকে এভাবেই এইসব গল্প শুনিয়েছেন।

বড় হবার পরও হালাল-হারামের ব্যাপারে শায়খের এই তাকওয়া অব্যাহত ছিল। যখন জর্ডান-ফিলিস্তিন সীমান্তে 'আশ-শুয়ুখ' ঘাঁটিতে শায়খ জিহাদরত ছিলেন, তখন মুজাহিদদের প্রচণ্ড রকম খাদ্যসংকট ছিল। হাতের কাছেই ছিল আশেপাশের গ্রামবাসীদের বাগান। বাগানগুলোতে ধরে ছিল গ্রীষ্মকালীন নানারকমের ফল। খাদ্যের এই সংকটের মধ্যে একটা ফলের প্রতিও কোনো মুজাহিদ হাত বাড়াননি।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান, অতঃপর বহিষ্কার এবং বাকি ইতিহাস

### জর্ডানে গমন

শায়খ তার নিজ গ্রামের কিছু যুবককে নিয়ে ইহুদি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৬৭ সনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর বাহিনী ত্যাগ করে আসা একজন জর্ডানি আর্মি অফিসার তাদেরকে পরামর্শ দিলেন এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। সেই সেনা অফিসার বলেছিলেন, দেশটা ইহুদিদের দালালদের হাতে বিক্রি হয়ে গেছে। আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। না হয় যেকোনো সময় ইসরাইলি ট্যাংক এসে তোমাদের পিষে মারবে; পৃথিবীর কেউ তোমাদের সম্পর্কে কিছু জানতেও পারবে না।

শায়খ ও তার সঙ্গীরা এ পরামর্শ মেনে নিয়ে তাদের ঘাঁটি থেকে সরে এলেন। সত্যিই দেখা গেল সরে আসার কিছুক্ষণ পরই ট্যাংকের গোলা এসে সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে।

মূলত ফিলিস্তিনি জনগণকে অন্ধকারে রেখে ইতিমধ্যেই দেশটা দালালদের হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এমন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে শায়খ আরও উপলব্ধি করলেন, ১৯৬৭ সনে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের ভয়াবহ পরাজয়ের পর

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা দিয়ে মুখরিত করে রাখতেন। গিবত, পরনিন্দা ও অহেতুক কথাবার্তা, যা বাকিদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, এগুলো থেকে তিনি শত শত ক্রোশ দূরে থাকতেন।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ জীবনের নিরন্তর পথচলায় স্বীয় রবের নিকট ধৈর্য, সালাত ও সিয়ামের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। শাহাদাতের দুসপ্তাহ পূর্বে সাময়িকীর সম্পাদকীয়তে তিনি নিজ মনের ভাব প্রকাশ করেন। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল يا أقدام الصبر، احملي অর্থাৎ 'হে দৃঢ়পদ, আমাকে সাথে নিয়ে যাও।'

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এমন উন্নত আখলাকের ওপর কেবল নিজেকে এবং নিজের আত্মাকে তরবিয়ত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার ছাত্রদেরকেও তরবিয়ত করতেন।

মুজাহিদ যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক ক্যাম্পে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর সাথে কাটানো একদিনের কথা আজও মনে পড়ছে। সেদিন যখন রাতের খাবারের সময় হলো, আমরা খাবার শুরু করলাম। কয়েক লোকমা খাবার গ্রহণ করতেই দেখতে পেলাম, শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বলছেন, 'সকলেই খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আমরা সকলেই রোজা রাখব।' এই পন্থায় তরবিয়তের সুদূরপ্রসারী কার্যকারিতা অনেক যুবক অনুধাবন করতে পারেনি। এটা তো তার পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব, যে বাস্তবজীবনে প্রকৃত তরবিয়তের গভীর জলাধিতে ডুব দিয়েছে এবং ভয়ানক যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখযুদ্ধে আল্লাহর শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করেছে।

## শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর নামাজ

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর নামাজ ছিল তার সকল কাজের আগে, সকল বিষয়ের প্রারম্ভে। যুদ্ধের ময়দানে যেখানেই তিনি অবতরণ করতেন এবং যেখানেই তিনি সফর করতেন, সালাতের সময় হয়ে গেলে নিজের সাথে থাকা যুবকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নিতেন। মাঝে মাঝে তিনিই ইমামতি করতেন, কখনো আবার ইমামতির জন্য কাউকে সামনে এগিয়ে দিতেন।

এই ছিল তার দীনদারির নমুনা। এমনকি নফল আমলসমূহও তিনি নিয়মিত করতেন। প্রায় সফরেই নফল আমলে যত্নবান থাকতেন। তিনি বলতেন, 'আমার

পিতার কাছ থেকে শৈশবেই আমি রাতের সালাত আদায় করার দীক্ষা লাভ করেছি। আমি দেখতাম, তিনি সর্বদা রাতে সালাত আদায় করতেন। আমিও তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আজ এ বার্ধক্যে উপনীত হয়েও আমার সে অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটেনি।'

রাতের সালাতের জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। নেতৃত্বের যোগ্য ও প্রবৃত্তির ওপর বিজয় লাভকারী ব্যক্তিরাই কেবল এই ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারে। আমি শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর নফসের মাঝে সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর সেই কথার প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সফরের মাঝে অন্যদের জন্যও রয়েছে সফরের শিক্ষা।'

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ সবসময় আমাদের সামনে একটি অমূল্য কথা বলতেন, **'মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমরা তখন জেগে উঠি। মানুষ যখন স্বস্তি লাভ করে আমরা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি।'**

## শায়খের ওজু

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করতেন। তিনি বলতেন, 'তিনটি জিনিস কখনো আমার থেকে দূরে থাকে না। ওজু, মেসওয়াক ও কুরআনের মুসহাফ।' জিহাদের ভূখণ্ডে এসে তিনি আরেকটি বিষয় যুক্ত করেন। 'যুদ্ধের অস্ত্র'।

## জিহাদ

জিহাদের কালিমা ও তাৎপর্য শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত ছিল, জিহাদের কালিমা এক অন্তর থেকে বের হয়ে হাজারো অন্তরে পৌঁছে যেত। আমরা দেখেছি, শায়খ রহিমাহুল্লাহ জিহাদের তাৎপর্য হৃদয়ে লালন করতেন। তিনি নিজ প্রসিদ্ধ অসিয়তের সূচনাতেই বলেছেন, 'জিহাদের ভালোবাসা আমার আবেগ-অনুভব-অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে।' কার্যত এটি ছিল সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য উপযোগী অসিয়ত। তিনি দাঈদের উদ্দেশ্য করে অসিয়ত করতেন, 'হে ইসলামের দাঈগণ, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের তরবারি কোষমুক্ত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাটির ওপর এবং সূর্যের নিচে তোমাদের কোনো মর্যাদা থাকবে না।' এগুলো হয়তো কিছু শব্দসমষ্টি, কিন্তু তা অন্তর থেকে এবং অভিজ্ঞতার গভীর থেকে বেরিয়ে আসত।